**Q) ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব আলোচনা করো।**

**অথবা, স্বল্পোন্নত দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করো।**

Ans. - ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন এবং নয়া–প্রাচীন (Classical ও Neo-Classical) অর্থনীতিবিদেরা বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রবার্টসন বৈদেশিক বাণিজ্যকে 'Engine of Growth' বলে অভিহিত করেছেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে একটি অনুন্নত দেশ নানা সুবিধা পেতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্যের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো উল্লেখযোগ্য :

প্রথমত, বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে দেশটি বিশেষায়নের (specialisation) নীতি গ্রহণ করে। ফলে দেশটি সেই সকল দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানি করে যেগুলো উৎপাদনে দেশটি বেশি দক্ষ। ফলে এতে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ঘটে।

দ্বিতীয়ত, আমরা জানি যে, অনুন্নত দেশে বিনিয়োগ প্রবণতা কম কারণ বাজার খুব সংকীর্ণ। ফলে মূলধন গঠন কম হয়। এর ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা ও আয় কম হয়। আয় কম বলে ক্রয় ক্ষমতা কম। ফলে অভ্যন্তরীণ বাজার সংকীর্ণ। আর বাজার সংকীর্ণ বলে উৎপাদকদের বিনিয়োগ প্রবণতা কম। এভাবে মূলধনের চাহিদার দিক থেকে এক দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র তৈরি হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য বাজারকে প্রসারিত করে এই বিনিয়োগ প্রবণতা বাড়াতে পারে। এভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙতে পারে।

তৃতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্য অনুন্নত দেশের চিরাচরিত ক্ষেত্রে (traditional sector) অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটায়। আমদানি দ্রব্য ক্রয় করার জন্য লোকে বেশি রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনের তাগিদ অনুভব করে। এভাবে অর্থনীতিটি ধীরে ধীরে বিনিময়ভিত্তিক অর্থনীতিতে (exchange economy) রূপান্তরিত হয়।

চতুর্থত, বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা অনুন্নত দেশের খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির সাথে উন্নত যন্ত্রপাতি, মূলধনি দ্রব্য ইত্যাদির বিনিময় ঘটে। এ সকল দ্রব্য অনুযত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। অনুমত দেশের অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে এই উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি কাজে লাগে।

পঞ্চমত, বৈদেশিক বাণিজ্যই অনুন্নত দেশে মূলধন আসার ভিত্তি। সাধারণত, অনুন্নত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ কোনো উন্নত দেশের সঙ্গে যত বেশি হয়, সেই উন্নত দেশ থেকে বৈদেশিক মূলধন তত সহজে অনুন্নত দেশে আসে।

ষষ্ঠত, বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নত কৃৎকৌশলগত জ্ঞান, দক্ষতা ও ধ্যানধারণা পাওয়া সম্ভব হয়। ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়ে। জাপানের প্রাথমিক উন্নয়ন এভাবেই সম্ভব হয়েছিল।

সপ্তমত, বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে কোনো অনুন্নত দেশ উন্নত দেশের সংস্পর্শে আসে। উন্নত দেশের আধুনিক ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনা অনুগত দেশটিকে প্রভাবিত করে এবং তার উন্নয়নে সাহায্য করে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের এসব সুবিধার পাশাপাশি কতকগুলো অসুবিধাও আছে। উন্নত দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে অনুন্নত দেশে নিম্নলিখিত সমস্যার সৃষ্টি হয়:

প্রথমত, উন্নত দেশে বৃহৎ আকারের কলকারখানায় উৎপাদন হয়। ফলে তারা আয়তনজনিত ব্যয়সংকোচের সুবিধা (scale economies) ভোগ করে। এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অনুন্নত দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং ছোট ছোট কলকারখানা ধ্বংস হন। অনুন্নত দেশটি প্রাথমিক স্নবা বা কাঁচামাল রপ্তানিকারী দেশই রায়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, অনুন্নত দেশগুলো মূলত খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে। এ সকল প্রশ্নের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক বলে দামের তীর ওঠানামা ঘটে। ফলে অনুন্নত দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তৃতীয়ত, প্রেরিশ এবং সিঙ্গারের মতে, অনুন্নত দেশের সঙ্গে উন্নত দেশের বাণিজ্য ঘটলে বাণিজ্য হার (terms of trade) অনুন্নত দেশের প্রতিকূলে থাকে। ফলে অনুন্নত দেশ থেকে উন্নত দেশে সম্পদের স্থানান্তর (transfer of resources) ঘটে। একে প্রেবিশ-সিঙ্গার তত্ব (Prebisch-Singer Thesis) বলে।

চতুর্থত, বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে অনেক সময় অনুন্নত দেশের অধিবাসীরা বিদেশি ভোগা প্রবোর প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে তাদের বিদেশি ভোগ্য দ্রব্যের উপর বায় খুব বেড়ে যায়। একে আন্তর্জাতিক প্রদর্শন প্রভাব (International demonstration effect) বলে। এর ফলে অনুন্নত দেশে সঞ্চয় কমে এবং মূল গঠন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

পঞ্চমত, বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নত দেশের বাণিজ্যচরুজনিত ওঠানামা অনুন্নত দেশেও ছড়িয়ে পড়ে।

মন্তব্য : বৈদেশিক বাণিজ্যের সুফল পেতে গেলে আয়োজত দেশকে কিছু বিষয়ে সতর্কতা অবলম্ব করতে হবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে এমন বাণিজ্য নীতি উদ্ভাবন করতে হবে যাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়, বাণিজ্যের শর্তটি অনুকূল হয় এবং লেনদেন ক্যালাপে চাপ না পড়ে। এ ব্যাপারে অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

----------#----------

**Q) পরিকল্পনাকালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা বর্ণনা করো।**

Ans.- **পরিকল্পনাকালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে পরিবর্তন (Changes in India's Foreign Trade during the Plan Period):**

পরিকল্পনাকালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন মূলত তিনটি দিকে ঘটেছে

প্রথমত, আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে।

দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনেরও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে।

তৃতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্যের দেশগত দিকেও পরিবর্তন ঘটেছে।

এখানে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণে পরিবর্তন নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো -

পরিকল্পনাকালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর পরিমাণ ও মুল্যে বিপুল বৃদ্ধি। পরিকল্পনাকালে আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই বিপুল পরিমাণে বেড়েছে। 1950–51 সালে ভারত মাত্র 50টির মতো দ্রব্য রপ্তানি করতো। বর্তমানে ভারত 3000 এরও বেশি দ্রব্য রপ্তানি করে। তেমনি, পাশাপাশি আমদানির পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। 1950–51 সালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ছিল 1,250 কোটি টাকা। 1980–81 সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় 19,000 কোটি টাকা। 1998– 99 সালে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল 3.17.703 কোটি টাকা। এর মধ্যে রপ্তানির পরিমাণ 1.41,604 কোটি টাকা এবং আমদানির পরিমাণ 176,099 কোটি টাকা। 1950 থেকে 1999 এই সময়ের মধ্যে টাকার অঙ্কে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ 250 গুণেরও বেশি বেড়েছে। এই বৃদ্ধির বেশির ভাগটাই ঘটেছে শেষ পনেরো বছরে। যেমন, 1951 থেকে 1971 সালের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্য মাত্র আড়াই গুণ বেড়েছিল। 1974 থেকে 1999 সালের মধ্যে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেছে। আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ যেমন বেড়েছে, আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের দামও বেড়েছে। এই দু'য়ের সম্মিলিত প্রভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের মূলো এই বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছে। 1950 থেকে 1999 সালের মধ্যে টাকার অঙ্কে রপ্তানি বেড়েছে 230 গুণ, আর আমদানি বেড়েছে 270 4 2000–01 থেকে 2013–14 এই মাত্র 14 বছরে রপ্তানি বেড়েছে 7 গুণ, আর আমদানি বেড়েছে প্রায় 9 গুণ। রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশি হারে বাড়ায় বাণিজ্য ঘাটতিও বেড়েছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্রমাগত বৃদ্ধি থেকে ভারতীয় অর্থনীতিতে এর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। তাছাড়া, বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি অর্থনীতির উচ্চতর উন্নতির স্তরও নির্দেশ করে। বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃদ্ধি ভারতীয় অর্থনীতির বৈচিত্র্যও প্রকাশ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ অবশ্যই আরও বাড়বে। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণে এই দ্রুত বৃদ্ধি সত্ত্বেও 2001 সালে বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অংশ ছিল মাত্র 0.61%। এই অংশ তাইওয়ান এবং সিঙ্গাপুরের ন্যায় ক্ষুদ্র দেশের চেয়েও কম। 1950–51 সালে বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অংশ ছিল 2.1%। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ খুব দ্রুত হারে বাড়লেও বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অংশ কমছে। এর অর্থ হল, বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ যে হারে বেড়েছে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ সেই হারে বাড়েনি। বিশ্ব বাণিজ্যের আঙিনায় যে নতুন নতুন বাণিজ্যের সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তার সবগুলোর সদ্ব্যবহার করতে ভারত ব্যর্থ হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের জাতীয় আরো বৈদেশিক বাণিজ্যের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে। 1985– 186 সালে জাতীয় আয়ে অবদান ছিল 12 শতাংশের কাছাকাছি। 1995–96 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় 21 শতাংশের মতো। এরপর অবশ্য জাতীয় আয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের অংশ মোটামুটি একই আছে (20 শতাংশের মতো)।

পরিকল্পনাকালে আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই বেড়েছে বটে, তবে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি তারে বেড়েছে। ফলে বাণিজ্য উদ্বৃত্তে ঘাটতিও বাড়ছে। 1998–99 সালে এই ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় 34.495 কোটি টাকা বা 8,199 মিলিয়ন ডলার। 2001–10 দশকে বাণিজ্য ঘাটতি ছিল গড়ে 48,648 মিলিয়ন ডলার। 2012–13 সালে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ 1,90,398 মিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। অবশ্য পরের বছর (2013– 14) তা কিছুটা কমে 1,37,461 মিলিয়ন ডলার দাঁড়ায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের রপ্তানি আয়, আমদানি ব্যয় মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। আর একটি কথাও বলার আছে। পৃথিবীর রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের রপ্তানির অংশ 1% এরও কম। কাজেই ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির যথেষ্ট অবকাশ আছে। রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন (export-led growth) ঘটানোর কৌশলটি ভারতে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি।

----------#----------

**Q) স্বাধীনতার পর ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা বর্ণনা করো।**

**অথবা, পরিকল্পনাকালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোতে যে সকল পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলো আলোচনা কর।**

**অথবা, স্বাধীনতার পর ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো।**

**অথবা, ভারতের সাম্প্রতিক আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করো।**

Ans.- **বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনে পরিবর্তন (Change in Composition of Foreign Trade)**

বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন বলতে কি কি দ্রব্য রপ্তানি ও আমদানি করা হয় তাকেই বোঝায়। সুতরাং, বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনে পরিবর্তন বলতে আমদানি ও রপ্তানি কাঠামোর পরিবর্তনকে বোঝায় অর্থ আমদানি ও রপ্তানি প্রব্যের তালিকা ও তার গুরুত্বের পরিবর্তনকে বোঝায়। আমদানি ও রপ্তানি কাঠামোর পরিবর্তন বিশ্লেষণ করালেই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি ও গঠনে পরিবর্তনটি বোঝা যাবে।

**আমদানি কাঠামো:** ভারতের প্রধান আমদানি দ্রব্যগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ভোগ্য দ্রব্য, কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী দ্রব্য এবং মূলধনি দ্রব্য। সাম্প্রতিককালে ভারতের প্রধান আমদানি এবং পেট্রোলিয়াম ( P), তেল (O) এবং লুব্রিক্যান্ট ( L)। এদের একসঙ্গে POL বলা হয়। সত্তরের দশকে এই POL দ্রব্যের আমদানি খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। 1997-98 সালে ভারতের মোট আমদানি ব্যয়ের 20% ছিল POL দ্রব্যাদির। জন্য যায়। 2004-05 সালে এই অংশ বেড়ে হয় 27.9%। 2020 সালের অক্টোবর মাস থেকে 2021 সালে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়ে অশোধিত তেলের নাম বিশ্ব বাজারে বেশ বেড়েছে। সুতরাং এই খাতে ভারতের আমদানি ব্যয়ের অংশ আরো বেড়েছে। আমাদের মুলধনি দ্রব্য আমদানির মধ্যে রয়েছে বৈদ্যুতিক ও অ-বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, পরিবহনের সাজসরঞ্জাম, ধাতব যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। কৃষিতে নয়া কৃৎকৌশলের প্রবর্তনের ফলে আমাদের সারের আমদানি বেড়েছে। ভারত সম্প্রতি ভোজ্য তেলও আমদানি করছে। এছাড়া, ভারতের আমদানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের ধাতু। এগুলোর মধ্যে আবার প্রধান হল লোহা ও ইস্পাত। লোহা ও ইস্পাত ছাড়া অন্যান্য ধাতু আমদানির মধ্যে রয়েছে ভাষা, দস্তা, টিন প্রভৃতি। ভারত হিরে, মুক্তো ও দামি পাথর বসানো অলঙ্কার বিদেশে রপ্তানি করে। কিন্তু এই অলঙ্কার তৈরির জন্য হিরে, মুক্তো ও দামি পাথর বিদেশ থেকে ভারতকে আমদানি করতে হয়। এছাড়া ভারত নানা রাসায়নিক দ্রব্যও আমদানি করে থাকে।

ভারতের আমদানি দ্রব্যের তালিকার দিকে তাকালে ভারতের আমদানি বাণিজ্যের কাঠামোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

প্রথমত, পরিকল্পনাকালে ভারতের আমদানি কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটছে। আগে ভারত প্রধানত খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল রপ্তানি করতো এবং শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করতো। অর্থাৎ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল ঔপনিবেশিক ধরনের। ভারতের বর্তমান আমদানি কাঠামোয় সেই ঔপনিবেশিকতার ছাপ আর নেই।

দ্বিতীয়ত, ভারতের আমদানি তালিকায় পাঁচটি প্রধান পণ্য হল: POL মুলধনি দ্রব্য, হিরে, মুক্তো ও দামি পাথর, রাসায়নিক দ্রব্য ও যাতু। এই পাঁচটি খাতে বর্তমানে মোট আমদানি। ব্যয়ের 70 শতাংশের মতো বায়িত হয়।

তৃতীয়ত, ভারতের বর্তমান আমদানি কাঠামোর মূলধনি দ্রব্য ও মধ্যবর্তী প্রবোর ( intermediate goods) গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এরূপ প্রব্যের আমদানিকে আমরা উন্নয়নমূলক আমদানি বলতে পারি। বর্তমানে আমদানিতে এই উন্নয়নমূলক আমদানির অংশ 80% এরও বেশি। আমদানির এই কাঠামো আমাদের শিক্ষোন্নতির পরিচয়ই বহন করে।

চতুর্থত, এমন কিছু দ্রব্যসামগ্রী। আমাদের আমদানি তালিকায় স্থান পেয়েছে যেগুলোর আমদানি করা হয় রপ্তানি বাড়ানোর জন্য বা ভবিষ্যতে আমদানি কমানোর জন্য। যেমন, মণিমুক্তো, যন্ত্রপাতি এবং নানা রাসায়নিক দ্রব্য।

পঞ্চমত, ভারত এখন শিল্পজাত সম্পূর্ণ দ্রব্য ( final product) বিশেষ আমদানি করে না। বরং শিল্প দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে। এমন সবাই বেশি আমদানি করে। এগুলোর সাহায্যে ভারত আমদানি-পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদন করে। ফলে অনেক জিনিসই যেগুলো আগে আমদানি করতে হত, সেগুলো এখন দেশেই উৎপন্ন হয়। এটি ভারতের শিল্পক্ষেত্রের বৈচিত্র্যের ( diversification) ইঙ্গিত দেয়।

**রপ্তানি কাঠামো :** ভারতের রপ্তানি দ্রব্যগুলোকে দু-ভাগে ভাগ করা যায় : চিরাচরিত নব্য ও সাম্প্রতিক দ্রব্য। চিরাচরিত রপ্তানি দ্রব্যগুলো হল চা, পাটজাত দ্রব্য, বস্তু, মশলা, কাঁচা চামড়া প্রভৃতি। সম্প্রতি যে সকল দ্রব্য রপ্তানিতে প্রাধান্য পাচ্ছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাসায়নিক দ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য, অলঙ্কার ইত্যাদি- নানারকম হস্তনির্মিত এবা, তৈরি পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি। শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে আছে বস্ত্র, তৈরি পোশাক- পরিখাদ, পাটজাত দ্রব্য, চর্মজাত দ্রব্য, অলঙ্কারসহ অন্যান্য হস্তশিল্প দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য। চা এবং কফি ভারতের চিরাচরিত রপ্তানি পণ্য। 1997-98 সালে কফি থেকে রপ্তানি আয় চা রপ্তানির আয়কে ছাড়িয়ে যায়। বস্তু এবং তৈরি পোশাক-পরিচ্ছদের রপ্তানিও সম্প্রতি খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। হস্তশিল্পজাত পণ্যের রপ্তানিও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মণিমুক্তো ও দামি পাথর বসানো অলঙ্কার।

ভারতের রপ্তানি কাঠামো থেকে দেখা যায় যে, মণিমুক্তো ও অলঙ্কার, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, তৈরি পোশাক পরিচ্ছদ, চর্ম ও চর্মজাত পণ্য এবং রাসায়নিক দ্রব্য এই পাঁচটি পণ্যের রপ্তানি আয় ভারতে মোট রপ্তানি আয়ের অর্ধেকেরও বেশি (প্রায় 60%)। পরিকল্পনাকালে ভারতের রপ্তানি কাঠামোতে যে সকল পরিবর্তন ঘটেছে, তার মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো উল্লেখযোগ্য:

প্রথমত, সত্তরের দশকের আগে আমাদের রপ্তানি কাঠামোতে চিরাচরিত পণ্যের যে প্রাধান্য ছিল তা আর নেই। দ্বিতীয়ত, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, চর্ম ও চর্মজাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, হস্তনির্মিত দ্রব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি অ-চিরাচরিত পণ্য থেকে রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে। তৃতীয়ত, সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রাসায়নিক পণ্যের রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, 1970-71 সালে ভারতে রপ্তানি বাণিজ্যে শিল্পজাত অন্যের অংশ ছিল 50.3% 2004-05 সালে এই অংশ বেড়ে দাঁড়ায় 73.4%। এটি ভারতের সাম্প্রতিক শিরোষরণের নির্দেশক।

সুতরাং, পরিকল্পনাকালে ভারতের রপ্তানি কাঠামোতেও উন্নয়নমুখী পরিবর্তন ঘটেছে। রপ্তানিতে গতির সঞ্চার হয়েছে এবং রপ্তানি বহুমুখী হয়েছে।

----------#----------

**Q) ভারতের সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো।**

Ans.- **ভারতের সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (Features of India's Foreign Trade in Recent Years):**

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে এর কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ভারতের সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখযোগ্য সেগুলো নিম্নরূপ :

1. প্রকৃতিগত পরিবর্তন : ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। রপ্তানি ক্ষেত্রে কৃষিজাত দ্রব্যের বদলে শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাধান্য বাড়ছে। আমদানি দ্রব্যের প্রকৃতিতেও পরিবর্তন এসেছে। পূর্বের ভোগ্যপণ্যের বদলে বর্তমানে শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির প্রাধান্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

2. পরিমাণ বৃদ্ধি : ভারতের সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এবং পরিমাণ এবং মূল্যে চমকপ্রদ বৃদ্ধি। 1950-51 সালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল 1,250 কোটি ঢাকা 1999-99 সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় 3:17,700 কোটি টাকা। অর্থাৎ 1950 থেকে 1999 সালের মধ্যে টাকার অঙ্কে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ 250 গুণেরও বেশি বেড়েছে। রপ্তানি বেড়েছে 230 গুণের মতো, আর আমদানি বেড়েছে 270 শুন্য। এই বৃদ্ধির বেশির ভাগটাই ঘটেছে শেষ 15 বছরে অর্থাৎ 1985-99 সালের মধ্যে। আর 2014-15 সালে মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়েছে 1950-51 সালের পরিমাণের 298 শুন। এর মধ্যে রপ্তানি বেড়েছে 245 গুণ, আর আমদানি বেড়েছে 352 গুণ। দেখা যাচ্ছে, রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশি হারে বেড়েছে। ফলে বাণিজ্য ঘাটতিও বেড়েছে।

3. বাণিজ্যের ব্যাপকতা : শুধু বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণই নয়, বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপকতা বেড়েছে। পূর্বে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের তিনটি প্রধান স্বপ্ন ছিল চা, পাটজাত দ্রব্য ও বস্ত্র। আগে রপ্তানি আয়ের অর্ধেকই আসতো এদের রপ্তানি থেকে। বর্তমানে এদের রপ্তানি থেকে আর মাত্র 10%। বর্তমানে ভারত নানা শিল্পজাত ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য রপ্তানি করে। আমদানি দ্রব্যের ক্ষেত্রেও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং মধ্যবর্তী দ্রব্যের গুরুত্ব বেড়েছে। এগুলো ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপকতা নির্দেশ করে।

4. দেশগত পরিবর্তন : ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশগত পরিবর্তন ঘটেছে। পরিকল্পনার শুরুতে বৈদেশিক বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যের গুরুত্ব ছিল বেশি। বর্তমানে সে স্থান দখল করেছে আমেরিকা। এখনও পর্যন্ত OECD দেশগুলোর প্রাধান্যই বেশি আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে। তবে OPEC এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে আদান প্রদান ক্রমশই বাড়ছে। তবে 2018-19 সালে গুরুত্বের দিক থেকে OPEC দেশগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির গুরুত্ব অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়েছে।

5. বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অংশ : পরিকল্পনাকালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়লেও বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অংশ ক্রমাগত কমছে। 1950-51 সালে বিশ্বের মোট বাণিজ্যে ভারতের কাংশ ছিল 2.19%। কিন্তু 2001 সালে এই অংশ কমে দাঁড়ায় 0.61561 এর অর্থ হল, এই সময়কালের মধ্যে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রসার যে হারে ঘটেছে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার সেই হারে ঘটেনি। ফলে বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অংশ কমেছে। 2019 সালের এপ্রিল মাসে WTO প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী 2018 সালে বিনো রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের অংশ ছিল 1.7%। আর প্রব্য আমদানি বাণিজ্যে এই অংশ ছিল 2.6% সেবাক্ষেত্রে এই অংশ ছিল যথাক্রমে 3.5% ও 3.2%।

6. আমদানি-পরিবর্ততা: ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল আমদানি-পরিবর্ততা (import substitution)। ভারত এখন অনেক জিনিস নিজেই উৎপাদন করে যেগুলো আগে আমদানি করতো। এর অর্থ হল, ভারত আমদানি-বিকল্প শিল্প গড়ে তুলেছে। বাইসাইকেল, সেলাই কল, অ্যালুমিনিয়াম প্রকৃতির আমদানি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

7. বাণিজ্য হারে অস্থিরতা: ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বাণিজ্য ঘরে অস্থিরতা। বাণিজ্য হারে হঠাৎ এবং দ্রুত ওঠানামা ঘটেছে। বাণিজ্য হারের দ্রুত ওঠানামা ঘটলে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাহত হয়। এর সঙ্গে রয়েছে বাণিঙ্গা হারে অবনতি। অনেক সময় নিট বাণিজ্য হার ভারতের প্রতিকূলে গেছে। ফলে অনেক সময় বৈদেশিক লেনদেন থেকে ভারতের লাভ না হয়ে ক্ষতি হয়েছে।

8. সরকারি হস্তক্ষেপ হ্রাস: 1990 সাল পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে সরকারি হস্তক্ষেপ খুব বেশি ছিল। কিন্তু 1991 সালে উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে সরকারি হস্তক্ষেপ নি দিন কমছে। রপ্তানি প্রসারের জন্য নানা রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। 2009-14 এবং 2015-20 সালের বাণিজ্য নীতিতে সে কথা খুব জোর দিয়ে বলা হয়েছে। এই দুই বাণিজ্য নীতিতে আমদানি ও রপ্তানি নীতি খুবই উদার করা হয়েছে।

9. রপ্তানি দ্রব্যে আমদানি-অংশ বৃদ্ধি: অনেক রপ্তানি দ্রব্য তৈরি করতে আবার কিছু আমদানি প্রবা লাগে। এভাবে রপ্তানি প্রব্যের মধ্যে আমদানির অংশ থাকে। একেই রপ্তানি প্রবো আমদানি-অংশ (import content) বলে। ভারতের রপ্তানি প্রবো আমদানি অংশ বাড়ছে। এর তাৎপর্য হল, রপ্তানি বাড়াতে গেলে আমদানি ব্যয়ও বেড়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, মণিমুক্তো ও দামি পাথর বসানো অলঙ্কার রপ্তানিতে আমদানি- অংশ বর্তমানে 80% । এর অর্থ হল রপ্তানি আয়ের 80% সোনা, মণিমুক্তো এবং দামি পাথর কিনতে বাড়ি হয়। ভারতের কারিগররা তাদের কাজে লাগিয়ে ঐ জিনিসের মূল্যের বৃদ্ধি (value added) ঘটিয়েছে 20%। এক্ষেত্রে ভারতের নিট আয় 20%।

10. প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত : ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্থায়ী প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত। দু-একটি বছর বাদ দিলে সমগ্র পরিকল্পনাকালে ঘাটতির পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েছে। আমাদের আমদানি ব্যয় যে হারে বেড়েছে, রপ্তানি আয় সেই হারে বাড়েনি। ফলে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। এ ব্যাপারে অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমাগত বাড়ছে।

----------#----------

**Q) গ্যাট (GATT) এর উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনার মূল বিষয়গুলো উল্লেখ করো। ভারতীয় অর্থনীতির উপর এই প্রস্তাবগুলোর কীরূপ প্রভাব পড়বে বলে তুমি মনে করো?**

**অথবা, গ্যাট (GATT)-এর উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনা কি কি বিষয়ের উপর ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রস্তাবগুলো কার্যকর হলে ভারত কী কী সুফল পেতে পারে? ভারতের অসুবিধাই বা কী হবে?**

Ans.- গ্যাট-এর উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনার নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি নতুন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) স্থাপিত হয়। বলা হয় যে, গ্যাট বা WTO এর সদস্যরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলবে :

1. সদস্য দেশগুলো কৃষিজাত পণ্যের আমদানি-রপ্তানির উপর পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ বা কোটা (quota) ধার্য করবে না। প্রয়োজনে কোটার পরিবর্তে আমদানি শুল্ক ধার্য করবে। আমদানি শুল্কের পরিমাণ হ্রাস করবে।

2. সুতি বস্ত্র এবং বয়ন শিল্পজাত দ্রব্যের উপর উন্নত দেশগুলো কর্তৃক আরোপিত আমদানি কোটা তুলে দেওয়া হবে দশ বছরের মধ্যে। এভাবে সুতি বস্ত্র ও বয়ন শিল্পজাত দ্রব্যের বাণিজ্যে উদারীকরণ করা হবে।

3. সদস্য দেশগুলো শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানির উপর আমদানি শুল্ক হ্রাস করবে।

4. সদস্য দেশগুলো বিদেশি বিনিয়োগের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে না এবং বিদেশি বিনিয়োগ ও স্বদেশি বিনিয়োগের মধ্যে কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।

5. সদস্য দেশগুলো তাদের পেটেন্ট ও কপিরাইট আইন সংশোধন করবে। খাদ্য, ঔষধপত্র, রাসায়নিক, দ্রব্য প্রভৃতির উৎপাদন পদ্ধতির পেটেন্টের পরিবর্তে উৎপন্ন দ্রব্যের পেটেন্ট চালু করবে।

6. ব্যাঙ্ক, বিমা, ভ্রমণ, জাহাজ পরিবহন, শ্রম প্রভৃতি সেবাকার্যকে এখন GATT এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হল। এই সমস্ত সেবাকার্যের আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে উদারীকরণ নীতি সদস্য দেশগুলো গ্রহণ করবে।

**ভারতের সুবিধা (Advantages of India):**

WTO-এর প্রতিষ্ঠা এবং নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ভারত যে সুবিধাগুলো ভোগ করবে বলে মনে করা হচ্ছে সেগুলো নীচে উল্লেখ করা হল:

প্রথমত, উন্নত দেশগুলো কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করলে ভারতের কৃষিজাত প্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনে ভারতের তুলনামূলক ব্যয় সুবিধা রয়েছে। কাজেই ভারত সহজেই এই জাতীয় প্রব্যের রপ্তানি বাড়াতে পারবে।

দ্বিতীয়ত, কৃষিভিত্তিক শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানিও বাড়বে। এইসব দ্রব্যের উৎপাদনে আমদানি করা কাঁচামাল কিছুই লাগে না। কাজেই এদের উৎপাদন ও রপ্তানি সহজেই বাড়ানো যাবে।

তৃতীয়ত, উন্নত দেশগুলোতে সৃতি বস্ত্রের আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ বাতিল করার কথা বলা হয়েছে। এতে ভারতের সুতি বস্ত্র শিল্প লাভবান হবে। সুতি বস্কের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

চতুর্থত, সেবাকার্যের আমদানি-রপ্তানির উদারীকরণ করা হলে ভারত বিদেশে শ্রম সেবা (Labour services) রপ্তানি করতে পারবে। আবার, ব্যাঙ্কিং, বিমা প্রভৃতি পরিসেবাও রপ্তানি করতে পারবে। এর ফলে ভারতের রপ্তানি থেকে আয় বাড়বে।

পঞ্চমত, বিদেশি বিনিয়োগের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হলে এবং স্বদেশি বিনিয়োগ এ বিদেশি বিনিয়োগের মধ্যে বিভেদমূলক আচরণ না করা হলে ভারতে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াটি জোরদার হবে।

ষষ্ঠত, GATT কর্তৃপক্ষের হিসেব অনুযায়ী উরুগুয়ে রাউন্ডের প্রস্তাবগুলো কার্যকর হলে পৃথিবীর মোট রপ্তানিতে ভারতের আশ 0.5% থেকে বেড়ে 1% হবে।

**ভারতের অসুবিধা (Disadvantages of India):**

অনেকে মনে করেন যে, নতুন ব্যবস্থায় ভারতের কিছু অসুবিধাও হবে। সেগুলোকে এখন উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, উৎপাদন পদ্ধতির পেটেন্টের পরিবর্তে এখন উৎপন্ন প্রব্যের পেটেন্ট চালু হবে। এর নাম দেওয়া হয়েছে বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্বের অধিকার (Trade Related Intellectual Property Rights বা TRIPS)। ফলে অনেক দ্রব্যের উৎপাদকদের এখন প্রবাটির প্রথম উদ্ভাবককে রয়ালটি দিতে হবে। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বাড়বে।

দ্বিতীয়ত, WTO অনুমোদিত পেটেন্ট নিয়ম অনুযায়ী কৃষিজাত দ্রব্য বা কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতি বা বায়োটেকনোলজিক্যাল পদ্ধতিরও পেটেন্ট নেওয়া যাবে। এতে ভারতের কৃষকদের ও কৃষি গবেষকদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। এই পেটেন্ট আইনের ফলে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর স্বার্থই রক্ষিত হবে।

তৃতীয়ত, Trade Related Investment Measures (TRIMs) বা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিনিয়োগ চুক্তিতে বিদেশি বিনিয়োগ এবং স্বদেশি বিনিয়োগের মধ্যে কোনো প্রভেদমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আপত্তিজনক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে। এই চুক্তি উন্নত দেশগুলোর বিনিয়োগকারীদের স্বার্থই সুরক্ষিত করবে।

চতুর্থত, নতুন ব্যবস্থার ফলে পরিসেবার ক্ষেত্রে উদারীকরণ ঘটবে। এর ফলে ব্যাঙ্ক, বিমা, যোগাযোগ, জাহাজ পরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিদেশি কোম্পানির অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটবে। এগুলোর আর্থিক ক্ষমতা এত বেশি যে, এগুলোকে ভারতে অবাধে কাজ করতে দিলে এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সংশ্লিষ্ট ভারতীয় কোম্পানিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পঞ্চমত, নতুন ব্যবস্থার ফলে ভারতের অর্থনীতিতে বেকার সমস্যা আরও তীব্রতর হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তার কারণ বিদেশি সংস্থাগুলো ভারতে অবাধে কাজ করলে অনেক ছোট ছোট ভারতীয় সংস্থা বন্ধ হয়ে যাবে এবং ঐ সমস্ত সংস্থায় কর্মরত শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়বে। আবার, বিদেশি সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে যে ভারতীয় সংস্থাগুলো টিকে থাকবে তারা তাদের উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য উৎপাদন পদ্ধতিতে অধিক। যন্ত্র এবং কম শ্রমিক ব্যবহার করবে। তার ফলেও কর্মসংস্থান কমবে এবং বেকার সমস্যা বাড়বে।

মন্তব্য: GATT-এর একটি হিসেবে দাবি করা হয়েছে যে, গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষর করার ফলে পৃথিবীর মোট রপ্তানিতে ভারতের রপ্তানির অংশ 0.5% থেকে কেড়ে 1% হবে। তাহলে বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে ভারতের বার্ষিক মোট লাভ 2.7 বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এই হিসেব বাস্তবানুগ নয়। শুধুমাত্র উদারীকরণ করলেই রপ্তানি বাড়বে না। ভারত যেমন সুবিধা পাবে, অন্য সদস্য দেশগুলোও এই সুবিধা পাবে। কাজেই ভারতের রপ্তানি পণ্যের সঙ্গে অন্যান্য দেশের রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগিতা দেখা দেবে। এই প্রতিযোগিতায় ভারতকে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হলে রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে হবে, রপ্তানি পণ্যের গুণগত মান বাড়াতে হবে। তা না হলে ভারতের রপ্তানির অংশ বাড়বে না।

----------#----------

**Q) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাজ কী কী এই সংস্থা স্থাপিত হওয়ার ফলে ভারতের অর্থনীতির উপর কীরূপ প্রভাব পড়বে বলে তুমি মনে করো?**

Ans.- **বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation)**

1947 সালে বিশ্বের 23টি দেশ জেনিভাতে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যা General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) নামে পরিচিত। এই চুক্তিবদ্ধ দেশগুলো নিজেদের মধ্যে বহুপাক্ষিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে সচেষ্ট হয়। ভারত GATT -এর একটি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। GATT চুক্তিতে চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য সময় সময় আলোচনার সংস্থান রাখা হয়েছিল। এরূপ আলোচনাকে রাউন্ড বলে। 1986 সালের পূর্বে এরূপ আলোচনা সাত বার অনুষ্ঠিত হয়েছে। অষ্টম বারের আলোচনা ( Eighth Round) অনুষ্ঠিত হয় 1986 সালে উরুগুয়ের পৃষ্ঠা তেল এস্ত শহরে। এই আলোচনা উরুগুয়ে রাউন্ড নামে পরিচিত। এই আলোচনা দীর্ঘ আট বছর ধরে চলে এবং এরই ফলশ্রুতি হিসেবে প্রস্তুত হয় ভালে সড়া ( Dunkel draft)। সদস্য দেশগুলো এই খসড়া 1994 সালের 15ই এপ্রিল অনুমোদন করে। এর ফলেই সৃষ্ট হয় একটি নতুন সংস্থা যার নাম বিশ্ব বাণি সংস্থা ( World Trade Organisation or WTO)। WTO-র কাজকর্ম শুরু হয় 1995 সালের 1 জানুয়ারি। 2021 সালের আগস্ট মাসে এর সদস্য ছিল । 64টি দেশ। GATT এবং WTO এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে GATT কোনো সংস্থা ছিল না। এটি ছিল একটি চুক্তিমাত্র। কিন্তু WTO একটি সংস্থা হিসেবে স্থাপিত হয়েছে। WTO চুক্তির তিন নম্বর ধারা অনুযায়ী WTO-এর কাজ পাঁচটি:

1. GATT চুক্তির শর্তগুলো রূপায়নের জন্য এবং বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির বিস্তারের জন্য এই সংস্থা সচেষ্ট হবে।

2. সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আলাপ আলোচনার একটি ফোরাম ( forum) হিসাবে এই সংস্থা কাজ করবে।

3. সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে এই সংস্থা বিবাদ মীমাংসার ব্যবস্থা করবে। বিবাদ। মীমাংসার জন্য প্রণীত ও অনুমোদিত নিয়মাবলি এই সংস্থা প্রয়োগ করবে।

4. বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা করার যে কর্মপদ্ধতি চুক্তিতে স্থির করা হয়েছে এই সংস্থা তা প্রয়োগ করবে।

5. বিশ্বের অর্থনৈতিক নীতিতে যতদূর সম্ভব সংস্কৃতি আনার জন্য এই সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার এবং এদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

সংগঠনগতভাবে WTO এর সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী হলো সদস্য দেশগুলোর মন্ত্রীদের সম্মেলন। এই সম্মেলন দু-বছরে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার কাজ চালানোর জন্য একটি সাধারণ সংসদ ( General Council) আছে। এই সংসদ সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। এই সাধারণ সংসদের অধীন তিনটি পৃথক সংসদ আছে দ্রব্যসামগ্রীর বাণিজ্যের সংসদ ( Council for trade in goods), সেবাকার্যের বাণিজ্যের সংসদ ( Council for trade in services) এবং মেধার সংক্রান্ত সংসদ ( Council for trade related aspects of intellectual property rights)। এছাড়া, সাধারণ সংসদ সদস্য দেশগুলোর বিবাদ মীমাংসা সংক্রান্ত কমিটি এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি পর্যালোচনা কমিটির বৈঠকও আহ্বান করে।

WTO স্থাপিত হওয়ার ফলে ভারতের কিছু সুবিধা হবে বলে অনেকে মনে করছেন। সংক্ষেপে সেগুলো হল : ( i) ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানি বাড়বে। ( ii) কৃষিভিত্তিক শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানিও বাড়বে। ( iii) উন্নত দেশগুলোতে সুতি বস্ত্রের আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ বাতিল হলে ভারতের সুপ্তি বস্ত্রের রপ্তানি বাড়বে। ( iv) ভারত বিদেশে শ্রমসেবা এবং ব্যাঙ্কিং, বিমা প্রভৃতি পরিসেবা রপ্তানি করতে পারবে। ( v) ভারতে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে।

কিন্তু ভারতের কতকগুলো অসুবিধাও হবে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ( i) নতুন ব্যবস্থায় ভারতে পেটেন্ট আইনে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। এটি ভারতের স্বার্থবিরোধী হবে। প্রব্যের উদ্ভাবককে রয়ালটি দিতে হবে। ফলে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ও দাম বাড়বে। ( ii) কৃষিজাত দ্রব্য বা তার উৎপাদন পদ্ধতিরও পেটেন্ট চালু হলে ভারতের কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ( ii) বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আপত্তিজ্ঞানক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। ( iv) পরিসেবা ক্ষেত্রে বিদেশি কোম্পানির অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটবে। এবং এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কোম্পানি মার খাবে। ( ৪) বিদেশি সংস্থাগুলো অবাধে ভারতে এলে ভারতের অনেক শিল্পই বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে বেকার সমস্যা বাড়বে।

মন্তব্য : GATT কর্তৃপক্ষের হিসেব অনুযায়ী, নতুন বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় ভারতের রপ্তানি উৎসাহিত হবে। বিশ্ব রপ্তানিতে ভারতের অংশ 0.5% হতে বেড়ে 1% হবে। কিন্তু এই হিসেব বাস্তবসম্মত নয়। উদারীকরণের ফলে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়বে। সুতরাং, ভারতকে রপ্তানি বাড়াতে হলে রপ্তানি প্রব্যের উৎপাদন ব্যয় কমাতে হবে ও গুণগত মান বাড়াতে হবে। তা না হলে ভারতের রপ্তানির অংশ বাড়বে না। পাশাপাশি, আমদানি উদারীকরণের ফলে আমদানি বাড়বে। সুতরাং, বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন। ক্যালান্সে ঘাটতি থেকেই যাবে। এছাড়া অনেকে মনে করেন যে, WTO এর কাজকর্মের ফলে বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব খর্ব হবে। WTO চুক্তির মধ্যে রয়েছে এমন অনেক বিষয় যেগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আগে ছিল সার্বভৌম রাষ্ট্রের। এই বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট সংক্রান্ত আইন, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত আইন, দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন প্রভৃতি। WTO-র তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, সেই সিদ্ধান্ত সমস্ত সদস্য দেশকেই মেনে

নিতে হবে। এর ফলে WTO চুক্তির মাধ্যমে এক বিশ্ব সংসদের সৃষ্টি হয়েছে, যে সংসদ এমন বিষয়ের উপর আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করছে যা আগে সদস্য রাষ্ট্রের ক্ষমতার মধ্যে ছিল। এভাবে সদস্য দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হয়েছে। বস্তুত উন্নত দেশগুলো এই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে অনুন্নত দেশগুলোর উপর তাদের অর্থনৈতিক প্রভুত্ব বজায় রাখছে।

----------#----------

**Q) বিশ্বব্যাঙ্ক কাকে বলে? বিশ্বব্যাঙ্কের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করো। ভারত এই সংস্থা থেকে কীভাবে সাহায্য পেয়েছে?**

Ans.- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলির সমাধানের জন্য এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের জন্য 1944 সালের 22শে জুলাই আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ারে অবস্থিত ব্রেটন উস নামক শহরে 44টি দেশ এক সম্মেলনে মিলিত হয়। এই সম্মেলন ব্রেটন উড্স সম্মেলন নামে পরিচিত। এই সম্মেলনে দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা বলা হয়। একটি হল আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার এবং দ্বিতীয়টি হল আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা বিশ্বব্যাঙ্ক। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হল এর সদস্য দেশগুলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের জন্য দীর্ঘকালীন ঋণ দেওয়া। এই ব্যাঙ্ক 1945 সালে কাজ শুরু করে। এর সদর দপ্তর হল আমেরিকার ওয়াশিংটন। যেসব দেশ আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সদস্য, তারা প্রত্যেকেই বিশ্বব্যাঙ্কেরও সদস্যঙ্গ কোনো দেশ যদি IMF এর সদস্যপদ ত্যাগ করে, তাহলে সেই দেশ বিশ্বব্যাঙ্কের সদস্য থাকতে পারে না। 2020 সালে অক্টোবর মাসে এর সদস্য ছিল 190টি দেশ।

প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে বিশ্বব্যাঙ্কের সদস্য হওয়ার জন্য চাঁদা দিতে হয়। এই চাঁদার তিনটি অংশ : (i) সদস্য রাষ্ট্রকে চাঁদার 2% সোনায় অথবা মার্কিন ডলারে দিতে হয়। (ii) সদস্য রাষ্ট্রকে চাঁদার 18% তার নিজের মুদ্রায় দিতে হয়। এই অংশটি বিশ্বব্যাঙ্ক অন্য যে-কোনো সদস্য রাষ্ট্রকে ধার দিতে পারে। (iii) চাঁদার অবশিষ্ট 80% সদস্য দেশটিকে সরাসরি দিতে হয় না। এটি সদস্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে একটি গৃহক আমানত হিসেবে জমা থাকে। বিশ্বব্যাঙ্ক প্রয়োজনমতো এই অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

গঠন : বিশ্বব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা হল পরিচালকমণ্ডলী বা বোর্ড অফ গভর্নবস্ প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র একজন গভর্নর এবং একজন বিকল্প গভর্নর পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ করে। এছাড়া রয়েছে 21 সদস্যবিশিষ্ট পরিচালকমণ্ডলী। এই 21 জনের মধ্যে 6 জন 6টি বড় শেয়ার হোল্ডার সদস্য দেশ কর্তৃক মনোনীত। এই 6টি দেশ হল আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান ও ভারত অবশিষ্ট 15 জন সদস্য বাকি সদস্য দেশগুলো দ্বারা নির্বাচিত হন। পরিচালকমণ্ডলীর মাসে একবার করে অধিবেশন বসে। পরিচালকমণ্ডলী ব্যান্ডের সভাপতিকে মনোনীত করে। তিনিই ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যনির্বাহী অফিসার। এছাড়া বিশ্বব্যাঙ্কের দুটি কমিটি আছে। একটি হল উপদেষ্টা কমিটি। এটি ব্যাঙ্ককে নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে। অপরটি হল ঋণ কমিটি, বিশ্বব্যাপ্ত যখন কোনো সদস্য দেশকে ঋণ দেয়, তখন এ কমিটি সেই ঋণের সম্ভাব্যতা যাচাই করে।।

উদ্দেশ্য : নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো নিয়ে বিশ্বব্যাঙ্ক গঠিত:

(i) সদস্য দেশগুলোর পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা।

(ii) সদস্য দেশগুলোতে বেসরকারি ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রসার ঘটানো।

(iii) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সম্পদ সৃষ্টির জন্য মূলধন দিয়ে সাহায্য করা। ।

(iv) দীর্ঘকালীন আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা।

(v) অনুন্নত দেশে জীবনযাত্রার মান বাড়ানো, এবং

(vi) পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য সদস্য দেশগুলোকে সাহায্য করা।

বিশ্বব্যাঙ্ক নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। (i) বিশ্বব্যাঙ্ক সদস্য দেশগুলোকে সরাসরি ঋণ দেয়। (ii) অনেক সময় বিশ্বব্যাপ্ত কোনো সদস্য দেশের কাছে ঋণ গ্রহণ করে সেই অর্থ অন্য সদস্য দেশকে প্রদান করে। (iii) কোনো সদস্য দেশের বিশেষ কোনো প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক ঋণ দেয়। (iv) বিশ্বব্যা ঋণের সাথে সাথে কারিগরি সহায়তাও দিয়ে থাকে। (v) বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাঙ্কের সদস্য দেশকে ঋণ দিলে বিশ্বব্যাংক ঋণের গ্যারান্টার হিসেবে কাজ করে। (vi) কোনো সদস্য দেশ অপর কোনো সদস্য দেশ থেকে ঋণ নিলে বিশ্বব্যাঙ্ক সেই ঋণের গ্যারান্টি দিয়ে থাকে।

আগে বিশ্বব্যাঙ্ক ঝুঁকি মূলধনে বা ইক্যুইটি মূলধনে টাকা ধার দিত না। তাছাড়া, সদস্য দেশকে ঋণ পেতে হলে এই দেশের সরকারের গ্যারান্টির দরকার হত। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক অর্থ কর্পোরেশন (International Finance Corporation বা IFC) গঠন করেছে। এছাড়া, অনুন্নত দেশের কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, শিক্ষা প্রভৃতির জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (Interational Development Association বা IDA স্থাপন করেছে।

মুল্যায়ন: বিশ্বব্যাঙ্কের কাজকর্মের কয়েকটি সমালোচনা করা হয়। (i) প্রয়োজনের তুলনায় বিশ্বব্যাঙ্কে সম্পদ সীমিত। (ii) এশিয়া ও আফ্রিকার সদস্য দেশগুলোর প্রতি বিশ্বব্যাঙ্ক নিরপেক্ষ আচরণ করে না। (iii) বিশ্বব্যাঙ্ক ঋণদানের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে বেশি গুরুত্ব দেয়। (iv) বিশ্বব্যাঙ্কের সুদ এবং কমিশনের হার বেশ বেশি। (v) ঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিশ্বব্যাঙ্ক নানা আপত্তিকর শর্ত আরোপ করেন্স (vi) অনেক সময় অর্থনৈতিক যুক্তি ছাড়াই ঋণ দেওয়া হয়।

এসব সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায় যে, অনুযত দেশের উন্নয়ন ও পুনর্গঠনে বিশ্বব্যাঙ্ক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে IDA-এর মাধ্যমে। IDA-কে বিদব্যান্ডের সুলত এ জানালা" বলা হয়। IDA 50 বছরের জন্য ঋণ দেয়। কোনো সুদ নেওয়া হয় না। নামমাত্র সার্ভিস

চার্জ নেওয়া হয় ঋণ পরিশোষের শর্তও যথেষ্ট উদার। এভাবে অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাঙ্ক এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

ভারত ও বিশ্বব্যাঙ্ক : ভারত বিশ্বব্যাঙ্কের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাঙ্ক সাহায্য করে আসছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্বব্যাঙ্ক নিম্নলিখিতভাবে ভারতকে সাহায্য করে চলেছে।

(i) বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকার খাদান করেছে। (ii) ভারতের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিবল্পনার জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষা চালিয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক। (iii) বিভিন্ন আর্থিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও মতামত সরবরাহ করেছে (এই ব্যাঙ্ক। (iv) বিশ্বব্যাঙ্ক যে সমস্ত প্রকল্পে ঋণ নিয়েছে সেই সমস্ত প্রকল্পের কাজকর্মের ব্যবস্থাপনা ও নিরক্ষণের জন্য সমীক্ষক দল এবং মিশন গ্রুপ প্রেরণ করেছে। (v) বিশ্বব্যাংক তার Economic Development Institute (EDI)-এ ভারতের বিভিন্ন প্রকল্পের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় কাজকর্মের বিষয়ে ট্রেনিং নিয়ে আসছে।

1949 সালের আগস্ট মাসের পর থেকে বিদব্যাঙ্কের সবচেয়ে বড় কণগ্রাহীতা দেশ হল ভারত। যে সমস্ত শিল্প বা ক্ষেত্র বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণে উপকৃত হয়েছে সেগুলি হল বন্দর, তেল অনুসন্ধান, গ্যাস, উড়োজাহাজ, কালা, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, সার এবং রেলপথ। ভারতের বিভিন্ন প্রকল্পে বিশ্বব্যাঙ্ক কারিগরি সহায়তাও প্রদান করেছে। বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্যের ফলেই ভারত 12 টি উন্নত দেশের দ্বারা গঠিত Aid India Consortium থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছে। 1995 সালের পর এই সংস্থার বদলে তৈরি হয়েছে India Development. Forum, ভারত বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান থেকেও আর্থিক সাহায্য পাচ্ছে।

এভাবে, বিশ্বব্যাঙ্কের সদস্য হিসাবে ভারত এই ব্যান্ড থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছে। কৃষি, শিল্প, শক্তি ও পরিবহনের উন্নয়নে বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য সম্প্রতি IDA থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ কমেছে। ফলে ভবিষ্যতে ভারতকে বিশ্বব্যাং থেকে বেশি বেশি ঋণ নিতে হবে। IDA কনের শর্তের চেয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের শর্ত কঠোর। IDA ঋণের ক্ষেত্রে সুদ লাগে না, শুধু নামমাত্র পরিসেবা চার্জ লাগে। সুতরাং, IDA ঋণ কমলে এবং বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ঋণের পরিমাণ বাড়লে ভারতের আর্থিক বোঝা বৃদ্ধি পাবে।

----------#----------

**Q) আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করো। এই ভাণ্ডার থেকে ভারত কেমন আর্থিক সহায়তা পেয়েছে তা বর্ণনা কর।**

Ans.- বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি সমাধানের জন্য এবং তাদের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের জন্যে। 1944 সালে বিশ্বের 44টি দেশ আমেরিকার ব্রেটন উডস-এ এক সম্মেলনে মিলিত হয়। ইহা ব্রেটন উডস সম্মেলন নামে খ্যাত। ব্রেটন উডস সম্মেলনে দুটি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একটি হল আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (International Monetary Fund বা IMF) এবং অপরটি হল বিশ্বব্যাঙ্ক। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার 1945 সালে কাজ শুরু করে। তখন এর সদস্য সংখ্যা ছিল 441 2020 সালের অক্টোবর মাসে এর সদস্য সংখ্যা ছিল 190। এর সদর দপ্তর ওয়াশিংটনে অবস্থিত।

IMF এর প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের একটি করে কোটা (Quota) থাকে। কোনো দেশের কোটার তিনটি তাৎপর্য আছে। (ক) যে দেশের কোটা যত বেশি, তাকে তত বেশি চাঁদা দিতে হয়। (খ) কোটা বেশি হলে IMF থেকে বেশি ঋণ পেতে পারবে। (গ) যে সদস্য রাষ্ট্রের কোটা যত বেশি, IMF-এ সেই সদস্যের ভোটের মূল্য তত বেশি।

গঠন : IMF-এর সর্বোচ্চ সংস্থা হল বোর্ড অফ গভর্নরস্। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র একজন করে গভর্নর নিয়োগ করে। এরপর, IMF-এর দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য রয়েছে পরিচালকমণ্ডলী। এর সদস্য সংখ্যা 22। এর মধ্যে আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, সৌদি আরব এবং চিন এই 6 দেশের সদস্যরা হল স্থায়ী সদস্য। বাকি 16 জন পরিচালক অবশিষ্ট সদস্য দেশগুলোর দ্বারা নির্বাচিত হন। পরিচালকমণ্ডলী নিজেদের মধ্যে একজনকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনোনীত করে। তিনিই IMF-এর প্রধান কার্যনির্বাহী অফিসার।

উদ্দেশ্য : নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো নিয়ে IMF গঠিত হয়েছে।

(i) বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা।

(ii) বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক বিনিময় হারে স্থায়িত্ব আনা।

(iii) বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা এবং অবাধ বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো।

(iv) কোনো দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি হলে আর্থিক সাহায্যের দ্বারা সকালে সেই ঘাটতি পূরণ করা।

(v) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বহুপাক্ষিক লেনদেন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(vi) বৈদেশিক বাণিজ্যের সুষম প্রসার ঘটানো এবং এর দ্বারা সদস্য দেশগুলোর আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।

কার্যাবলি: IMF তার উদ্দেশ্যগুলো পুরণের জন্য নানা কাজ করে থাকেন সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(1) আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তার প্রসার ঘটাতে IMF চেষ্টা করে।

(2) লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যহীনতা দূর করতে IMF সদস্য দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

(3) IMF সদস্য দেশগুলোর মধ্যে মুদ্রার বিনিময় হারের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করে।

(4) সদস্য দেশগুলো যাতে আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ কমায়, IMF তার প্রচেষ্টা চালায়।

(5) IMF সদস্য দেশগুলোকে আর্থিক ও রাজস্ব সম্পর্কিত বিষয়ে নানা পরামর্শ দিয়ে থাকে। (6) IMF সদস্য দেশগুলোকে লেনদেন ব্যালাপের সমস্যা দূর করার জন্য দক্ষ কর্মী দিয়ে সাহায্য করে। (7) IMF নানা অর্থনৈতিক বিষয়ে গবেষণা চালায় ও তার ফলাফল প্রকাশ করে।

তবে এই সমস্ত কাজের মধ্যে সদস্য দেশকে ঋণ প্রদানই প্রধান কাজ। IMF থেকে কোনো সদস্য দেশ কত ক্ষণ পেতে পারে তা সেই দেশের কোটার উপর নির্ভর করে। এই ঋণের পরিমাণের ১টি অংশ আছে। ঋণের পরিমাণ প্রথম অংশ ছাড়িয়ে গেলেই ঋণের শর্তও কঠোর হতে কঠোরতর হতে থাকে। সাধারণত, কোনো সদস্য দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি বা ভারসাম্যহীনতা দূর করার জন্য ঋণ দেওয়া হয়। আবার, প্রচণ্ডভাবে ঋণী দেশকে কাঠোেমাগত সংস্কারের জন্যও ঋণ দেওয়া হয়।

মূল্যায়ন : আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের কাজকর্মের কয়েকটি সমালোচনা করা হয়। (i) IMF এর আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় কম। (ii) উন্নত দেশগুলোর কোটা বেশি বলে তাদের ভোটের মূল্য বেশি। ফলে তারা IMF-এর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। (iii) IMF অনুন্নত দেশগুলোকে ঋণ প্রদানের সময় নানা আপত্তিকর শর্ত আরোপ করে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। (iv) IMF এখনও সদস্য দেশগুলো কর্তৃক বৈদেশিক বাণিজ্যে বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ দূর করতে পারেনি।

তবুও, বর্তমান আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায় IMF এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক তারল্যের সমস্যা মেটানোর জন্য 1970 IMF সালে চালু করেছে Special Drawing Rights বা SDR | SDR হল IMF-এর হিসাব-নিকাশের অর্থ। বাস্তবে SDR নোট বলে কিছু নেই। কিন্তু এই SDR সকল সদস্য দেশই গ্রহণ করে। আগে যেমন সোনা সকল দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল, SDR তেমনি সদস্য দেশগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য। এজন্য SDR-কে paper golds বলা হয়। কাজেই SDR আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এই SDR ব্যবস্থা প্রবর্তন করে IMF আন্তর্জাতিক তারল্যের সমস্যাকে অনেকটা কমাতে পেরেছে।

ভারত এবং IMF (India and the IMF):

ভারত IMF-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। 1945 সালের 27 ডিসেম্বর ভারত অর্থ ভাণ্ডারের চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। IMF এর সাহায্য থেকে যে সমস্ত দেশ বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছে ভারত তাদের মধ্যে অন্যতম। 1947 থেকে 1955 সালের মধ্যে ভারত তার লেনদেন ব্যালাপে অসুবিধা দূর করার জন্য দু'বার 100 মিলিয়ন ডলার ধার করে। 1955 থেকে 1975 সালের মধ্যে ভারত আটবারে মোট 1.764 মিলিয়ন ডলার ঋণ নেয়। IMF বিশ্বস্ত তহবিল (IMF Trust Fund) থেকেও ভারত স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করে। 1978 থেকে 1981 সালের মধ্যে গৃহীত এরূপ ঋণের পরিমাণ ছিল 529.01 মিলিয়ন SDR। লেনদেন ব্যালান্সের সমস্যা দূর করার জন্যই এই ক্ষণ গ্রহণ করা হয়।

1979 সালে IMF-এর সম্প্রসারিত তহবিল সুবিধা (Extended Fund Facility বা EFF) থেকে ভারতকে 5.6 বিলিয়ন ডলার বা 5,220 কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ভারত অবশ্য 3.9 বিলিয়ন ডলার ঋণ হিসাবে তুলেছিল। 1990 সালের ডিসেম্বর মাসে উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে ভারত লেনদেন ব্যালান্সে সংকটের সম্মুখীন হয়। তাই IMF এর পূরণমূলক এবং আপৎকালীন অর্থসংস্থান সুবিধা (Compensatory and Contingency Financing Facility বা CCFF) থেকে অর্থসংস্থানের জন্য আবেদন আনানো হয় এবং সেখান থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়। যে-কোনো সদস্য দেশ সাধারণত তার কোটার 50 থেকে 60 শতাংশ পর্যন্ত তা পায়। কিন্তু ভারত তার কোটার 100 শতাংশেরও বেশি পরিমাণ ঋণ পেয়েছে। IMF-এ ভারতের কোটার পরিমাণ 3.01 বিলিয়ন ডলার (বা 2.2 বিলিয়ন SDR)। কিন্তু জানুয়ারি 1991 থেকে জুন 1993 সালের মধ্যে ভারতের IMF থেকে প্রাপ্ত মোট ঋণের পরিমাণ 35 বিলিয়ন ডলার।

ঋণ ছাড়াও ভারত IMF থেকে অন্যান্য কিছু সুবিধাও পেয়েছে। IMF এর সদস্য হওয়ার সুবাদে ভারত বিশ্বব্যাঙ্কেরও সদস্য। বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ভারত তার নানা উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য আর্থিক সাহায্য পেয়ে আসছে। তাছাড়া, আর্থিক, রাজস্ব সম্পর্কিত এবং লেনদেন ব্যালান্স সম্পর্কিত নানা পরামর্শ IME ভারতকে দিয়ে থাকে। এসব বিষয় সম্পর্কে ভারতীয় কর্মীদের নানা স্বল্প সময়ের ট্রেনিংও IMF দিয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শুধু অর্থ সাহায্য নয়, উন্নয়ন বিষয়ক নানা কারিগরি সাহায্যও ভারত IMF-এর নিকট পেয়ে আসছে।

তবে IMF এর ভূমিকার কিছু সমালোচনাও করা হয়। প্রথমত, বলা হয় যে, IMF-এর ঋণের শর্ত সহজ না। সুদের হার এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ বর্তমান। দ্বিতীয়ত, অনেকে মনে করেন যে, ক্ষণ দেওয়ার নামে IMF ভারতের নানা অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ কারে থাকে। একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের কাছে এটা খুবই আপত্তিকর। যেমন, অনেকে মনে করেন যে, 1991 সাল থেকে ভারতে যে নয়া আর্থিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তা IMF-এর চাপেই গৃহীত হয়েছে। তৃতীয়ত, বলা হয় যে, IMF, বিশ্বব্যাঙ্ক ও WTO-কে নিয়ে যে নতুন আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে তাতে উন্নত দেশগুলোর স্বামই দেখা হচ্ছে। ভারতের ন্যায় স্বায়ান্নত দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে না। এই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো অনুন্নত দেশগুলোর উপর তাদের আধিপত্য বজায় রাখছে বলে অনেকে মনে করেন।

এসব সমালোচনা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে, বিভিন্ন সময়ে ভারত IMF থেকে ঋণ নিয়ে লেনদেন ব্যালাদের ঘাটতি মিটিয়েছে। IMF এর কাছ থেকে ভারত কারিগরি সহায়তা এবং ট্রেনিং-এর সুবিধা পেয়েছে। আর্থিক ও রাজস্ব বিষয়ে নানা পরামর্শ পেয়েছে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে IME নানা প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য করেছে। সুতরাং IMF থেকে ভারত যে উপকৃত হয়েছে এ বিষানো সন্দেহ নেই।

----------#----------